কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট ১৩

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ১১৯টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

বর্তমান কোভিড-১৯ অতিমারি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওপর এ অতিমারির অভিঘাত তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ঝুঁকিতে থাকা এসব মানুষের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা। এই প্রেক্ষাপটে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আগামী অর্থবছরের বাজেট সামনে রেখে গত ৯ মে ২০২১, রবিবার "জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী থাকছে"- শীর্ষক মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে। করোনা পরিস্থিতিতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আগামী বাজেটে কী কী ধরনের নীতি সিদ্ধান্ত ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন সেসব বিষয় তুলে ধরতে এই ব্রিফিংটি করা হয়। ভার্চুয়াল এই ব্রিফিংয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সংযুক্ত ছিলেন। কোর গ্রুপ সদস্য, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আলোচকরা জানান, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের ভিতরে পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং যাদেরকে এখন পেছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ইস্যু, চাহিদা, তাদের জন্য করণীয়, এসব বিষয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে। এ মানুষদের সমর্থন দেওয়ার যৌক্তিকতা, এবং আগামী বাজেটে কোন্ ধরণের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে এবং কীভাবে তা দেওয়া উচিৎ সে বিষয়ে বক্তারা মতামত প্রদান করেন।

জাতীয় বাজেট ২০২১-২২
পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী থাকছে?

প্রেক্ষাপট

প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের স্বাগত জানান। তিনি মনে করিয়ে দেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ বা এসডিজিতে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এসডিজি'র বাস্তবায়ন যখন তার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্যায়ে আরো বেগবান হওয়ার কথা তখনই কোভিড-১৯ সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও আঘাত হেনেছে। আর এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত এক বছরে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি আলোচনার আয়োজন করেছে।

তিনি মিডিয়া ব্রিফিংয়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, কোভিডের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আরও পিছিয়ে পড়েছে। এ কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট তাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগামী বাজেটে এসব পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ, বর্তমানে করোনার সময়ে তাদের জন্য কোন্ ধরণের প্রণোদনা নেওয়া হয়েছে এবং তা পর্যাপ্ত কি না - এসব বিষয় নিয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রস্তাবনাগুলি তুলে ধরার জন্যই এই মিডিয়া ব্রিফিং-এর আয়োজন করা হয়েছে।

কেমন আছেন প্রান্তিক মানুষ?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তার উপস্থাপনায় বলেন, কোভিডের দ্বিতীয় ধাক্কা চলছে। তৃতীয় ধাক্কা যে আসবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রথম ধাক্কার পরে একধরনের পুনর্জাগরণ বা পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছিল। এর ফলে কাজ হারানো অনেক মানুষ কর্মসংস্থানে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন যদিও অনেকের আয় কমে গেছে, অনেকে কম দক্ষ কাজে যোগ দিয়েছে এবং ব্যাপকভাবে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব রয়ে গেছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিমারি পিছিয়ে পড়া বা অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপকভাবে আঘাত হেনেছে। এর ফলে তাদের ভোগে সমস্যা হচ্ছে ও

পুষ্টিহীনতা বাড়ছে; স্বাস্থ্যঝুঁকি তো রয়েই গেছে। পাশাপাশি তাদের ঋণগ্রস্থতা বাড়ছে, স্কুল থেকে ঝরে পড়া বাড়ছে এবং একইসাথে তারা সামাজিক বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে দেশের ভিতরে বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে।

মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন, অনেকে যারা প্রান্তিক ছিলেন, তারা প্রান্তিকতর হয়ে গেছেন। যারা উপান্তিক ছিলেন, তারা প্রান্তিক হয়ে গেছেন। সিপিডি'র এক গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিডের কারণে প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ কোনো না কোনো সময় কাজ হারিয়েছিলেন। এখন তাদের অনেকেই শ্রমবাজারে আসছেন। তবে একটি অংশ সেবা কিংবা শিল্পখাত থেকে কৃষিতে চলে গেছেন; যার ফলে তাদের আয় কমে গেছে। অনেকের জীবনে মধ্যে প্রান্তিকতার একটা বৈশিষ্ট্য নতুনভাবে যোগ হয়েছে।

শাহীন আনাম বলেন, দারিদ্র্য অবশ্যই একটি প্রান্তিকতা। কিন্তু কিছু জনগণ যেমন- আদিবাসী, দলিত, হরিজন, প্রতিবন্ধী মানুষ, বেদে, জেলে- এদের প্রান্তিকতা অন্যরকম। দরিদ্রতার সাথে সাথে তারা আরো নানা ধরণের বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকার।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ও চারটি ট্রিগার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তার উপস্থাপনায় বলেন, এই মুহূর্তে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বিরাজমান। মূল্যস্ফীতি এক ধরণের স্থির পর্যায়ে আছে। এর পাশাপাশি বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত রয়েছে। টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। সমস্যা যেখানে দেখা যাচ্ছে তা হলো- সরকার যেসব আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন গত বাজেটে উপস্থাপন করেছিল, সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এর পাশাপাশি একটা অনিশ্চিত বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের সামনে। এ অবস্থায় একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন। নীতি নির্ধারকদের ধারণা ছিল, সেপ্টেম্বর নাগাদ বাংলাদেশ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে। এর মধ্যে আরেকটি বাজেট চলে এসেছে এবং অতিমারির আরেকটি ধাক্কার মধ্যে মানুষ জীবন যাপন করছে। দ্বিতীয় ধাক্কার প্রেক্ষাপটে নেওয়া সরকারের নীতিগুলো যদি ঠিকমতো বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, অর্থনীতির শক্তিশালী পুনরুজ্জীবনের জন্য অন্তত দুই থেকে তিন বছরের একটি কাঠামো নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ। ধারাবাহিকতার দিক থেকে এবং নিশ্চয়তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধুমাত্র এক বছরের বাজেট নিয়ে চিন্তা করার সময় এখন নয়। সেক্ষেত্রে দুই থেকে তিন বছরের কাঠামোকে বিবেচনায় নিয়ে বছরওয়ারী বাজেটকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পুনরুদ্ধার কৌশল হাতে নিতে হবে। এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে আগামী অর্থবছরে চারটি ট্রিগার কাজে লাগাতে হবে—ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় এবং রপ্তানি।

তিনি উল্লেখ করেন, যদি মানুষের মধ্যে ভোগ কমে যায় তাহলে তাদের পুষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর তার বৈরী প্রভাব পড়বে এবং দরিদ্রতা ও বৈষম্য বাড়বে। বিনিয়োগ যদি না বাড়ে তাহলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। বাজেট ঘাটতি একটু বেশি হলেও সরকারি ব্যয় বাড়াতে হবে, প্রকৃত বা নিট রপ্তানি বাড়াতে হবে। অর্থাৎ আমদানি করা কাঁচামাল নির্ভর রপ্তানিতে দেশজ মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

ড. মোস্তাক রাজা চৌধুরী স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, করোনা সংকট আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনেক দুর্বল দিক চিহ্নিত করেছে। এর একটি হলো- এ খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা হয়নি। স্বাস্থ্য খাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ সবচেয়ে কম ব্যয় করে। আমাদের অবস্থান নিচ থেকে দ্বিতীয়। প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা আমাদের চেয়ে ৪ গুন বেশি ব্যয় করে। বিনিয়োগের পাশাপাশি গুরুত্ব রয়েছে অগ্রাধিকার নির্ধারণের। টাকা কতটুকু দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারছি- সেটাই মূল বিষয়। এর সাথে সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আসিফ ইব্রাহিম বলেন, এ বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর বেশি গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনৈতিক উত্তরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে প্রণোদিত করা ছাড়া এই অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করার আর কোনো উপায় নেই।

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর মনে করেন, তিনটি ট্রিগ্রার অর্থাৎ ভোগ, বিনিয়োগ ও রপ্তানি; বেসরকারি খাতের হাতে। বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ব্যয় কমাতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের সুদহার হ্রাস একটি বড় অর্জন, যা অব্যাহত রাখতে হবে। সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রণোদনার ঋণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বড়রা পায়, ছোটরা পায় না। নিজের প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, প্রণোদনার ঋণের যতটুকু চাহিদা ছিল তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ পাওয়া গেছে। কারণ প্রণোদনার প্রায় পুরোটাই চলে গেছে তৈরি পোশাক খাতে। তার মতে, বরাদ্দ নীতিকে সুনির্দিষ্ট এবং পরিস্কার করা উচিৎ।

তৈরি পোশাক ও পোশাক বহির্ভূত খাত যেন সমান মনোযোগ পায়, সে ধরণের নীতি নেওয়া উচিৎ। দীর্ঘমেয়াদি শিল্প ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে একটা তহবিল গঠনের সুপারিশ করে সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, খাত বিশেষে টেকসই শিল্প, নতুন প্রযুক্তি ও নতুন বাজারের জন্য ২ শতাংশ সুদে ১০ বছর মেয়াদে এ তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়নের জন্য পুঁজির যে চাহিদা তার প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রয়োজন। এ ধরণের তহবিল গঠন করলে বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন উপকৃত হবে।

নীতি ও পদক্ষেপ কী হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের উপস্থাপনায় বলা হয়, পুনরুজ্জীবনের পদক্ষেপগুলোর সাথে কাঠামোগত সংস্কারের পদক্ষেপগুলোকে যুক্ত করতে হবে। এর জন্য উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। দক্ষতা বাড়িয়ে নারীদের সংযোজন করতে হবে। যুব সমাজের কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র আনতে হবে। নতুন রপ্তানি বাজারে যেতে হবে। বেশিরভাগ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে এবং তা কোভিডের কারণে বেড়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে বের হতে হবে। উপস্থাপনায় আরো উল্লেখ করা হয়, সরকারের পক্ষ থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা বাড়াতে হবে। এটি না করা গেলে ভোগ ও জীবনের মানের বিষয়ে গুরুতর ব্যতয় ঘটবে এবং বৈষম্যের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। পুনরুজ্জীবন ও কাঠামোগত সংস্কারের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এসডিজি একটা ভালো কাঠামো হতে পারে। এসডিজি আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের একটি কর্মসূচি। এর সাথে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এই মুহূর্তে যেহেতু লকডাউন ইত্যাদির কারণে একটা মন্দা পরিস্থিতি রয়েছে তার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শ্লথ হয়ে গেছে। এটি একটি দুষ্টুচক্রে পরিণত হয়েছে। এই চক্রের বিপরীতে একটি নীতিভঙ্গি নিতে হবে। চক্রের বিপরীতে যেতে হলে সম্প্রসারণমূলক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যেতে হবে। অর্থাৎ সরকারের ব্যয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে তারল্য - দুটোকেই বাড়াতে হবে। তারল্য বাড়ালে অনেক সময় মূল্যস্ফীতি হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। সরকারের ব্যয় বাড়ালে দায়-দেনা বেড়ে যায়। সরকারের দায়-দেনা একটু একটু করে বাড়লেও তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। বৈদেশিক সহায়তা বেশি নিতে গেলে অনেক সময় বিনিময় হারের ওপর চাপ পড়ে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ অনেক ভালো অবস্থায় থাকার কারণে সেক্ষেত্রেও তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ব্যয় বাড়ালে বাজেট ঘাটতি বেড়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তে বাজেট ঘাটতি অনেক কম আছে। সেক্ষেত্রে বাড়লে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতিভঙ্গিতে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। কৌশলগত প্রাধিকার প্রশ্নে তিনি বলেন, যে অর্থ খরচ করা হচ্ছে, তার ফলাফল যদি অর্থনীতিতে বহুগুনে বড় করে আনতে হয় তাহলে দুটো কাজ করতে হবে। একটি হলো- যে সমস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খরচ করার প্রবণতা বেশি সেই সব জায়গায় নগদ সহায়তা দিতে হবে। দরিদ্র পরিবার তারা সঞ্চয় করে না, টাকা পেলেই তারা তা ভোগে ব্যয় করে। সেটা অর্থনীতিতে চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনকে প্রণোদিত করে। তাতে অর্থনীতিতে ইতিবাচক চক্রের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত- ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা প্রান্তিক তাদেরকে টাকা দিলে তারা সেটা ব্যবসার কাজে লাগাবে। সেকারণে তাদের হাতে টাকা দিতে হবে। ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের হাতে টাকা দিতে হবে। কৃষিতে শস্য তোলার পরে সেখানে যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে; আইটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে উচ্চমূল্যের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হবে। বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন করতে হবে। ছোট ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তারল্য সহায়তা দিতে হবে। পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, তথ্য ভান্ডারকে শক্তিশালী করা। যারা সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা পেতে পারেন তাদের তালিকা সমন্বিতভাবে করাটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাধা কোথায়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত খুবই কম এবং গত বছর তা আরো কমে গেছে। দেশে যেখানে ৬ থেকে ৭ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, সেখানে কর-জিডিপি অনুপাতের পতন ঘটার বিষয়টিতে প্রশ্নের অবকাশ আছে। বৈদেশিক সহায়তার দ্রুত ব্যবহার করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে যে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়, তা ব্যবহার করা হয় না। যেটুকু ব্যবহার করা হয়, তার গুনমান সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। নতুন প্রকল্পের ভিতরে ১০ টাকার জিনিস কীভাবে ১০ হাজার টাকায় কেনা হচ্ছে, তা সবাই অবগত। গত অর্থবছরের আর্থিক কাঠামোর ওপর মন্তব্য করতে যেয়ে তিনি বলেন, গত অর্থবছরে কর-জিডিপি অনুপাত ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ থেকে নেমেছে ৯ দশমিক ৪১ শতাংশে। জিডিপির ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয় ছিল ২০১৮-১৯ অর্থবছরে, যা নেমে গেছে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশে। ২০১৯-২০ একটি ভিন্নধর্মী অর্থবছর ছিল। এ বছর কর আদায়ের হার যেমন পড়ে গেছে, সরকারের ব্যয়ও পড়ে গেছে। যেখানে বাজেট ঘাটতি বাড়ার কথা ছিল, সেখানে কমে গেছে। চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে কর আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র অর্ধেক এবং বৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে আগের একই কর-জিডিপি অনুপাতের জন্য কর আদায় অন্তত ১০ শতাংশ বাড়তে হবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে

পরিস্থিতি আরো নাজুক অবস্থায় আছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিকতম ইতিহাসে ব্যয়ের হার এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। বৃদ্ধি তো দূরের কথা, চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ কম ব্যয় হয়েছে। মোট লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। বাজেটের ঘাটতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার বৈদেশিক সহায়তা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারছে না। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে পরিমাণ ধার নেওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে। মোট ঘাটতির ৫৮ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেওয়ার কথা ছিল, যা ইতোমধ্যে ৬৪ শতাংশ হয়ে গেছে। ব্যাংক এবং সঞ্চয়পত্র থেকে বেশি ঋণ নেওয়া হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যের উৎসগুলো থেকে ঘাটতি মেটানো হচ্ছে।

পুনর্বন্টন, কর ন্যায্যতা ও কর প্রস্তাব

মোস্তাফিজুর রহমান বাজেটের মূল দর্শনের দিক তুলে ধরে আগামী অর্থবছরের জন্য কিছু সুপারিশ করেন। তার মতে, বাজেটের দর্শনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হলো পুনর্বন্টন। এর মানে সমাজের বেশি আয়ের মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষের জন্য তা ব্যয় করা। তিনি উল্লেখ করেন, কোভিডের সময় বৈষম্য আরও বেড়েছে। আয় বৈষম্য বেড়েছে। কেননা অনেকের কাজ চলে গেছে বা কম আয়ের কাজে যোগ দিতে হয়েছে। ভোগ বৈষম্য বেড়েছে। চালের দাম গত এক বছরে ২০ শতাংশ বেড়েছে। যা সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কেননা গরিব মানুষের আয়ের একটা বড় অংশ চাল কিনতে ব্যয় হয়। ফলে গরিব মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে। পাশাপাশি সম্পদ বৈষম্য বেড়েছে। অনেকের আয় কমে যাওয়ার কারণে সঞ্চয় ভেঙে ফেলতে হয়েছে। বাজেটের দর্শন যদি পুর্নবন্টন হয় তাহলে আগামী বাজেটে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাম্য ও ন্যায্যতার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেখানে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি গত বছরের বাজেটে সর্বোচ্চ করহার ৩০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পদক্ষেপকে অন্যায্য উল্লেখ করে বলেন, নিচের দিকে সুবিধা দিলেও অপেক্ষাকৃত বেশি আয়ের মানুষ বেশি সুবিধা পেয়েছেন। কোভিডের বছরে যেখানে আরও পুনর্বন্টন দরকার ছিল, সেখানে আয়করের কাঠামো বৈষম্যমূলক হয়েছে। তিনি পরামর্শ দেন, এটি আবার ৩০ শতাংশে উন্নীত করা হোক। সহায়তা দিতে হলে নিচের দিকে আয়ের স্তরে তা দেওয়া উচিৎ। গত বছর ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ১০ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশের একটি নতুন স্তর করা হয়েছে আয়করের ক্ষেত্রে। মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ এমন একটি ব্যবস্থা যার ফলে সৎ করদাতারা অনুৎসাহিত হন। এ ধরণের সুযোগের ফলে সৎ করতাদাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হচ্ছে তিনি তার হিসাব করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, এ বছর ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। অথচ এর কারণে যে ক্ষতি হয়েছে সেই হিসাবটা আমরা করিনি। যারা ৩০ শতাংশ হারে কর দিতেন, তারা হাল-নাগাদ কর না দিয়ে এখন অপেক্ষা করবেন কখন পরবর্তীতে ১০ শতাংশ কর দেওয়ার সুবিধা পাওয়া যাবে। এর ফলশ্রুতিতে কর আদায় যে পরিমাণে কম হয় তার হিসাব করলে নিট লাভ-ক্ষতির হিসাব বের হয়ে আসবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, আগামী অর্থবছরের বাজেটে নতুন করে কোনো কর আরোপ করা উচিৎ হবে না। করের হারও বাড়ানো উচিৎ হবে না। কারণ এই মুহূর্তে মানুষ ব্যাপকভাবে আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যেসব জায়গায় ফাঁক-ফোকর আছে অর্থাৎ যারা কর দেয় না এবং যারা কম কর দেয়- কর আদায়ের ক্ষেত্রে সেই সব জায়গায় নজর দিতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন রেয়াত ও সুবিধা দেওয়া আছে, যার কোনো অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নেই। হয়তো সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে এগুলো করা হয়েছে। এসব রেয়াত বাদ দিতে হবে। বরং অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে, বিশেষ করে শ্রমঘণ শিল্প করহার ও শুল্কহার তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। এই মুহূর্তে তাদের জন্য সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা যতটুকু আছে তা প্রকাশ্য নয়। অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী শিল্প কাঠামোতে সেই মনোযোগ নেই। কালো টাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিহীন, নৈতিকভাবে গর্হিত এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপকারী কালো টাকা সাদা করার সুযোগ, বিদেশে টাকা পাচার এবং সেই টাকা না আনা, এবং সম্পদের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা না করা- এগুলোকে আগামী অর্থবছরে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। একদিকে গরিব মানুষকে খাওয়ানোর জন্য ঠিকমতো টাকা দেওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া দেশের স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তিতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। যারা নিয়মিত কর দেন তাদেরকে অযথা হয়রানি বন্ধ করা, রাজনৈতিক কারণে কর ফাইলকে ব্যবহার করা ইত্যাদি যেন না করা হয়।

আসিফ ইব্রাহীম তালিকাভুক্ত কোম্পানির ওপর কর ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব দেন। তিনি মনে করেন, এর ফলে ভাল মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানিরা পুঁজিবাজারে আসতে উৎসাহিত হবে। এসএমই বোর্ডের যারা তালিকাভুক্ত হতে চায়, তাদের জন্য ৫ বছর পর্যন্ত ১০ শতাংশ কর নির্ধারণের প্রস্তাব করেন তিনি।

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর উল্লেখ করেন, বিপণন ব্যয়ের জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে শুন্য দশমিক ৫ শতাংশ। পৃথিবীর কোথাও এমন নেই। একটা এফএমসিজি কোম্পানির প্রোমোশনাল ব্যয়ের জন্য ৫ থেকে ১০ শতাংশ বাজেট থাকে। এ সময়ে যখন চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে আগের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে সে সময়ে এ নিয়ম তুলে দেওয়া উচিৎ। ই-কমার্সে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের ওপর ২০ শতাংশ অগ্রিম কর এবং ১৫ শতাংশ ভ্যাট কমানোর প্রস্তাব দেন তিনি। প্রকৃষ্ট করারোপ নীতির পরিপন্থি উল্লেখ করে এটি বন্ধের সুপারিশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম আয়কর ২০১০ সাল পর্যন্ত ৩ শতাংশ ছিল এবং এরপর ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এ হার আগের জায়গায় নেওয়া বা আরও কম করা উচিৎ। আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর ট্রেডিং কোম্পানির জন্য চূড়ান্ত নিস্পত্তির সময় সমন্বয় করা যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ক্ষেত্রে করা যায় না। এ বৈষম্য নিরসন ঠিক করা উচিৎ। তিনি প্রস্তাব করেন, রপ্তানিতে উৎসে করের ক্ষেত্রে সকল খাতকে একই হারে আনতে হবে। বৈষম্য বন্ধ করতে হবে। এছাড়া রপ্তানিতে প্রণোদনার ওপর উৎসে কর ১০ শতাংশ থেকে আগের ৩ শতাংশে নেওয়ার প্রস্তাব করেন।

আয় ও ব্যয় বাড়াতেই হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের উপস্থাপনায় বলা হয়, প্রতি বছর কর আদায় জিডিপি-র শুন্য দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ বাড়িয়ে আগামী ৫ বছরে জিডিপি-র ১৫ শতাংশে নেওয়া সম্ভব। এটি এশিয়া অঞ্চলের গড়ের সমান হবে। অন্য দেশগুলো অবশ্য এই সময়কালে আরও এগিয়ে যাবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রাজস্ব বাজেট বাস্তবায়নের হার উন্নয়ন বাজেটের বাস্তবায়নের হারের চেয়ে বেশি। এ প্রবণতা থেকে বের হতে হবে। রাজস্ব ব্যয় বাড়ছে, তবে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে না। এটা সাম্প্রতিক কালে বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক ধরনের বিচ্যুতি। মেগা প্রকল্প যেগুলো আছে এবং যেগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে সেগুলোতে অর্থ বরাদ্দ করা হোক, যাতে প্রকল্পগুলো শেষ হয়। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে; বিশেষত যেগুলো শুরু হয় নি সেগুলোর ক্ষেত্রে সময় নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, নগদ হস্তান্তর অন্তত জিডিপির শুন্য দশমিক ৫ শতাংশ হতে হবে। একটি সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার কথা বলা হচ্ছে অথচ স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির মাত্র ১ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে। প্রত্যেক বছরে আধা শতাংশ বাড়িয়ে আগামী ৫ বছরে জিডিপির সাড়ে ৩ শতাংশে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন আছে ২ শতাংশ যা একই হারে বাড়িয়ে আগামী ৫ বছরে অর্থাৎ ৮ম পঞ্চবার্ষিকীর সময়কালে জিডিপির সাড়ে ৪ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। তাহলে করোনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব উদ্বেগ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত এবং এর সাথে শিশু, নারী ও প্রবীণদের নিয়ে যেসব উদ্বেগ রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলা করা সহজ হবে। তিনি মনে করেন, আগামী অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বাজেট ঘাটতি যদি জিডিপির ৬ শতাংশের বেশিও হয়, কোনো সমস্যা হবে না। এখন যে ঘাটতি প্রাক্কলনের চেয়ে কম, তার কারণ ব্যয় করার সক্ষমতার অভাব। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহার করতে হবে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে। ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সংযত হতে হবে।

কোভিডকালে সরকারি সহায়তার মূল্যায়ন

দেবপ্রিয় উল্লেখ করেন, সরকার গত দেড় বছরে প্রায় ২৫ টি কর্মসূচি নেওয়ার কথা বলেছে। এর মধ্যে ১৯ টি নতুন এবং ৬ টি পুরনো কর্মসূচির সম্প্রসারণ। এর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে খাদ্য সহায়তাসহ প্রত্যক্ষ সহায়তা ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। বাকিটা হাইব্রিড সহায়তা অর্থাৎ কম সুদে ঋণ দেওয়া। ৮০ শতাংশ সহায়তা প্রত্যক্ষ নয়, এটি সহজ শর্তে ঋণ। তার উপস্থাপনায় বলা হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা জিডিপি-র মাত্র শুন্য দশমিক শুন্য ৪ শতাংশ। আর মোট বরাদ্দের অংশ হিসেবে মাত্র ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। খাদ্য সহায়তা জিডিপি-র শুন্য দশমিক ১২ শতাংশ এবং মোট সহায়তার ৪ দশমিক ২৩ শতাংশ। আর্থিক সহায়তা ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে জিডিপি-র শুন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ হয় এবং মোট বরাদ্দের ৪৪ শতাংশ হয়েছে। তবে এর ভিতরে সরকার এমন কিছু কর্মসূচি ঢুকিয়েছে, যা আদতে কোভিডের সাথে জড়িত নয়। যেমন ধান-চাল সংগ্রহের খরচকে সহায়তার তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার প্রত্যেক বছরে কৃষিতে যে ভর্তুকি দেয়, তাকেও এই তালিকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের জন্য বড় অংকের বরাদ্দ এর মধ্যে ঢুকেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে গরিব মানুষকে যে ঘরবাড়ি দেওয়া হয়েছে, তাও এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে কোভিডের জন্য নিট আর্থিক সহায়তা কার্যত অনেক কম। হিসাব করে দেখা গেছে, চলতি অর্থবছরে নিট আর্থিক সহায়তা চলতি অর্থবছরে জিডিপি-র মাত্র শুন্য দশমিক ১৯ শতাংশ । শুধু আর্থিক সহায়তা কম দেওয়া হয়েছে তা নয়, যা দিয়েছে তার সব খরচ করতে পারে নি। আড়াই হাজার কোটি টাকার বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের মাত্র ৪৩ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। ৫০ লাখ দরিদ্র মানুষকে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ টাকা দেওয়ার কর্মসূচিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। ৩৫ লাখ লোক এ সহায়তা পেয়েছে। সুতরাং সরকার যে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, তা পুরনো কর্মসূচি দিয়ে স্ফীত করা হচ্ছে। প্রকৃত আর্থিক সহায়তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং যেটুকু বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তার বিতরণের ক্ষেত্রেও অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

সমস্যা অর্থের নয়, অর্থ ব্যবহারের

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত বছর অনেকেই আলোচনা করেছেন, টাকা পয়সা আছে কি না? দেওয়া যাবে কি না? এই বছরে চিন্তা টাকার লভ্যতা নয়, টাকা খরচ করার যোগ্যতা ও দক্ষতা। খরচ করা না গেলে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর দৈন্যতা, অভাবগ্রস্থতা ও ঋণগ্রস্থতা বাড়বে। তিনি উল্লেখ করেন, সরকারের পক্ষ থেকে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তিন স্তরের কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র সরকারের পরীবিক্ষণ কমিটি দিয়ে বাস্তবায়নকে গতিশীল করা যাবে না। কারণ এর গভীরে যেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং নীতি ও মনস্তাত্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। পুরো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যদি এনজিও, ব্যক্তিখাত এবং নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা না হয়, তাহলে এর গুনমান ভাল হবে না। বাংলাদেশ এখন এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে আছে যেখানে এই দুর্যোগকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যাবে। আগামী বাজেটে সেই ধরণের সাহসিকতা, সেই ধরণের দূরদর্শিতা এবং সেই ধরণের উদ্ভাবনী ব্যবস্থা থাকবে বলে তিনি আশা করেন।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা টার্গেট করি তাহলে বাজেটের বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বাড়াতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠী যারা আছেন, তাদেরকে নগদ হস্তান্তর বেশি করে দেওয়া হোক। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ব্যয় অন্তত ৫০ শতাংশ বাড়ানো হোক। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে। ঈদের পর কোভিড কোন দিকে যায় তা অনিশ্চিত। শ্রমিকদের ব্যাপক হারে কোভিড টেস্ট সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। এর জন্য শ্রম অধিদপ্তরের মতো সংস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে ১৫০০ কোটি টাকা শ্রমিকদের সহায়তায় দেওয়ার ঘোষণা দেয় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত তার ১ শতাংশও বিতরণ হয়নি। সাভার ও গাজীপুর অঞ্চলে ৩০ হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশেরই তথ্য; শ্রমিক সংগঠনের হিসাবে তা আরো বেশী। এসব মানুষকে কিন্তু এখনই সহায়তা দেওয়া দরকার। ওয়াকার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডের একটা নীতিমালা করা দরকার। এ বছর বেকারত্ব ভাতা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত রেমিটেন্সের ওপর যে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা উচিৎ। যারা এখন বিদেশে যাচ্ছেন, তাদেরকে ভবিষ্যৎ আয়ের বিপরীতে ভ্রমণ ঋণ সহায়তা দিলে তারা উপকৃত হবেন।

শাহীন আনাম বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে বাজেটের ১৬ শতাংশের বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য রয়েছে শুন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। দলিত, হরিজন, ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক গোষ্ঠীসহ এ ধরণের সবার জন্য বরাদ্দ মাত্র ২ শতাংশ। বরাদ্দ ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে কি না, তারা এর সুফল পাচ্ছে কি না - এরকম কোনো মনিটরিং-এর ব্যবস্থা নেই। দলিতদের বাড়ি করার জন্য সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত একটা বরাদ্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বরাদ্দের কি হয়েছে তা জানা নেই। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট করে এবং ঠিকমতো মনিটরিং করে তারা যেন এর সুবিধা পায় সেখানে দৃষ্টি দিতে হবে। হিজড়া, যৌনকর্মী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না। কীভাবে তাদেরকে বাজেটের সহায়তার আওতায় আনতে পারি তার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে

মোস্তাক রাজা চৌধুরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পরার্শ দেন। তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি কিছু প্রস্তাব দেন। স্বল্পমেয়াদি প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছেঃ জরুরি সরবরাহ যেমন- অক্সিজেন, আইসিইউ বেড, ভেন্টিলেটর, টেস্টিং ইক্যুইপমেন্ট ইত্যাদির সংকুলান, প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের জন্য টিকা সংগ্রহ ও টিকাদান, সামাজিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ এবং গবেষণার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি। তিনি বলেন, সব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলা হয়। কিন্তু তা শুধু কাগজ-কলমে। বাস্তবে কিছুই হয় না। আগামী দু'বছরে এ খাতে বিনিয়োগ দ্বিগুন করতে হবে। শুধু টাকার পরিমাণ বাড়ালেই চলবে না, বর্ধিত টাকা কোথায় খরচ করা হবে তার যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। বলা হয়ে থাকে, প্রতিটি সংকটের একটি সম্ভাবনার দিকও থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলো ধ্বংসাবশেষের ওপর তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি করে। ৯০ দশকের পর রুয়ান্ডায় গণহত্যার পর নির্মিত হয় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি। উন্নত দেশে ধনী-গরিব সবাই উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা পায়। নিজ থেকে একটি টাকা খরচ করতে হয় না।

এটিই সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা। কাগজ-কলমে বাংলাদেশেও নিখরচায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে দেখা যায়, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। এ অবস্থায় মানুষ বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। একজন নাগরিককে তার স্বাস্থ্য খরচের ৭৪ ভাগ নিজের পকেট থেকে যোগান দিতে হয়। এর ফলে কম করে হলেও ২০ থেকে ৩০ লাখ লোক প্রতি বছর চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়িত হলে এ অবস্থার অবসান ঘটবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে কোভিড একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে উল্লেখ করে মধ্যমেয়াদে কয়েকটি অগ্রাধিকারের সুপারিশ করেন তিনি। তিনি বলেন, একটি স্থায়ী স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করতে হবে, যার কাজ হবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশে কীভাবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় তার একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করা এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করা। স্বাস্থ্য খাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা' কার্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে। যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরবরাহকারী ও ক্রয়কারীকে আলাদা করা যাবে এবং জবাবদিহিতা অনেকটা নিশ্চিত করা যাবে। সুশাসন এবং সুচারু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রাধিকার বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ২৫ ভাগ খরচ হয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়। এর ফলভোগী দেশের ৭০ ভাগ নাগরিক। প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী যদি হতো তাহলে শহরের হাসপাতালের ওপর সাম্প্রতিক যে চাপ আমরা দেখেছি সেটা হতো না।

শিক্ষায় নজর দিতে হবে

রাশেদা কে চৌধুরীর মতে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, বাজেটে শিক্ষা খাত অবহেলিত। নীতিগত জায়গা থেকে প্রথমেই বিবেচনায় নিতে হবে এই মুহূর্তে শিক্ষায় কারা পিছিয়ে পড়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে যদি বাজেট করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র সামাজিক সুরক্ষার দিকে নজর দিলে চলবে না, তাদের শিক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। বাজেটের অর্থ ব্যবহারের দুর্বলতা কাটাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে যে অর্থায়ন হয় সেখানে সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে এবং তা ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর কাছে কতটুকু যায়, তা দেখতে হবে। তিনি মনে করেন, প্রাথমিক স্কুলগুলো জাতীয়করণ হওয়ায় এক ধরণের স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে হাজার হাজার শিক্ষক এখন অন্য কাজ খুঁজছেন। কারণ যারা এমপিওভুক্ত নন, তারা বেতন-ভাতা পাচ্ছে না। বাজেটে তাদের জন্য পদক্ষেপ থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, ইংরেজি মাধ্যম ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় বাজেট কাঠামোতে আনতে হবে। শিক্ষা গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব দেন রাশেদা কে চৌধুরী। এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন, 'গবেষণায় আমরা তেমন কোনো বাজেট বরাদ্দ দেখতে পাই না। আমরা যে পরিকল্পনা করব, বাজেট বিভাজন করব, তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত কই? কোভিড পরিস্থিতিতে জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে কত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে আমরা জানি না। যারা ভর্তি হয় নি, তাদের জন্য কি প্রস্তুতি, কি পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করছি? সেই সক্ষমতার জায়গা থেকে বাজেটকে দেখতে চাই'। তার মতে, শিক্ষায় বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। বিশেষ করে সুবিধা এবং সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য, যাদের সক্ষমতা নেই অনলাইন ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা ডাটা কেনার। যারা এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে শিশুশ্রম ও বাল্য বিবাহের দিকে ঝুঁকছে, বাজেট প্রণয়নের সময় তাদের বিষয়টিকেও বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি বলেন, যদি করোনার বিষয়টি মাথায় নিয়ে বাজেট তৈরি হয় তাহলে শিক্ষার জন্য অবশ্যই প্রণোদনা থাকতে হবে। সব খাতের জন্যই প্রণোদনা প্যাকেজ হয়েছে, শিক্ষায় নেই। একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষা খাতকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে প্রযুক্তি খাতের সাথে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ব্যয়ও এখানে অন্তর্ভুক্ত। রূপপুর পারমানবিক কেন্দ্রের ব্যয়ও এখানে আছে। শিক্ষাকে কখনও ধর্মের সাথে, কখনও প্রযুক্তি খাতের সঙ্গে এক করে বাজেট দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাকে একটা স্বতন্ত্র খাত হিসেবে বিবেচনা করে বাজেট বরাদ্দ ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

শিশু ও জেন্ডার বাজেট

মোস্তাফিজুর রহমান শিশু বাজেট আবার শুরু করার সুপারিশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, শিশুদের যে ক্ষতি হচ্ছে সে বিষয়ে নজর দেওয়া উচিৎ। শিশুদের শিক্ষার সমস্যা বেশি হলে সামাজিক গতিশীলতা নষ্ট হবে। শাহীন আনাম এ বিষয়ে উল্লেখ করেন, কোভিডকালে দুস্থ শিশুরা আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। শিশুদেরকে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে মিলিয়ে বাজেট করা হয়। আলাদা কোনো বাজেট নেই। এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার সুপারিশ করেন তিনি।

শাহীন আনাম জেন্ডার বাজেটের প্রসঙ্গে বলেন, ৪২ টি মন্ত্রণালয় জেন্ডার বাজেট করে। সেই বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি বেশ ছড়ানো এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যে সমন্বয়ের দায়িত্ব রয়েছে তা কাজে লাগছে না। এত বড়

বাজেট কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নারীরা এর সুফল পাচ্ছে না। যেমন- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু *ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাব* প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি অর্ধেক পথে যেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে এবং সেই বরাদ্দের কী হয়েছে তা জানা যায় নি। তিনি মনে করেন, যেসব মেয়েরা এখন লেখাপড়া থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা খুবই দরকার। কারণ বাল্যবিবাহ বাড়ছে এবং এর কারণে অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণের মতো সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

কেমন আছে বেসরকারি খাত

আসিফ ইব্রাহিম উল্লেখ করেন, করোনার কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানি ৩৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে যায়, যা তার আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম। আমদানি খাতেও আমাদের পতন হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগও কমে গেছে। চলতি অর্থবছরের ৭ মাসে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমেছে ২৮ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমেছিল ৩৯ শতাংশ। ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে শিল্প খাতের মেয়াদি ঋণ বিশেষ করে কটেজ, মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (সিএমএসএমই) খাতে ঋণ বিতরণ ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। অনেক প্রবাসী শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়ে দেশে ফিরেছেন। এখনকার মত রেমিট্যান্স প্রবাহ বেশ বাড়লেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হবে তা অনিশ্চিত। তিনি বলেন, করোনা মহামারির কারণে স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৯ এর তুলনায় ২০২০ সালে এসএমই খাতে আয় ৬৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ কমেছে। লাইট ক্যাসল পার্টনার্সের এক জরিপে দেখা গেছে, ৪৬ শতাংশ এসএমই টিকে থাকতে ব্যয় কমানোর জন্য ৫০ শতাংশ শ্রমিক ছাঁটাই করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এসএমইতে চাকরিচ্যুতি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে পদক্ষেপ থাকা উচিৎ। তিনি বলেন, শ্রমিকদেরকে জন্য ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার তহবিলে রপ্তানির শুন্য দশমিক শুন্য তিন শতাংশ অর্থ জমা দেওয়ার একটা নিয়ম রয়েছে। এর যথাযথ ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ থাকতে হবে। প্রথম পর্যায়ে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য যে ঋণ দেওয়া হয়, তার মাধ্যমে ২৯ লাখ শ্রমিককে বেতন দিতে তিন সপ্তাহের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো সহায়তা দিতে হলে এই অবকাঠামো ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রধান গন্তব্যস্থল ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং সেখানে জার্মানি প্রধান বাজার। জার্মানির প্রতিষ্ঠান ডিস্ট্যাটিসের এ বছরের জানুয়ারির এক প্রতিবেদনে তাদের গবেষণা অনুযায়ী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক, পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্যের বাণিজ্য কমেছে ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশ। এই চারটি পণ্য থেকে সেদেশে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশ আসে। রপ্তানি পণ্যের আরেক গন্তব্য ইতালিতে ২০২০ সালে পারিবারিক খরচ কমেছে ২৩ শতাংশ। ম্যাকেঞ্জির স্টেট অব ফ্যাশন রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে ইতিবাচক অবস্থা থাকলেও জুতার বাজার ২০১৯ সালের ব্যয়ের পর্যায়ে ফিরে যেতে পারবে কেবলমাত্র ২০২২ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা থাকলে ২০২৩ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে। চাহিদা, ক্রয়ক্ষমতা, বিপণন ও ভোগ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রপ্তানি গন্তব্যের দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থায় কিভাবে বাজার ধরে রাখা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর উল্লেখ করেন, ইসলামপুর কাপড়ের মার্কেটে ৬ হাজার ৫০০ দোকান আছে। তাদের ঈদুল ফিতরের বিক্রি সারা বছরের ৬০ শতাংশ। এ সময়ে তাদের ১০ হাজার কোটি টাকার বিক্রি হয়। এ বছর তারা ৭০ শতাংশ বিক্রি হারিয়েছে। গত বছর হারিয়েছিল ৮০ শতাংশ। এর সঙ্গে গ্রামীণ ও শহরের অর্থনীতি সংযুক্ত। এর বহুমুখী প্রভাব যে কত মারাত্মক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শহরাঞ্চলে জুতার রিটেইল ব্যবসা ২০১৯ এর ঈদের তুলনায় ৪৬ শতাংশ কম। ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে, ফলশ্রুতিতে চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আসিফ ইব্রাহিম বলেন, আমাদের দেশে ঈদের সময়, বিশেষত ঈদুল ফিতরের সময়, ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক বাড়ে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অনেক গতিশীল হয়। গত বছরও করোনার কারণে ঈদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়েছিল, এ বছরেও তা হয়েছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

দৈনিক প্রথম আলোর আরিফুর রহমান জানতে চান, কালো টাকা সাদা করার প্রবণতা কেন বেড়েছে এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এ প্রক্রিয়ার বিপক্ষে কেন? এর উত্তরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সাধারণভাবে বলা হচ্ছে, এই মুহূর্তে দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাচারের ক্ষেত্রে এক ধরণের পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে। মানুষ দেশের বাইরে যাচ্ছে কম। ফলে সাথে করে অর্থ নেওয়া কমেছে। আর্ন্তজাতিকভাবে নিয়মকানুন জোরদার হয়েছে। নজরদারি বাড়ছে। অন্যদিকে কালো টাকা সাদা করার

ক্ষেত্রে কোনো ধরণের প্রশ্ন না করার সুযোগ দেওয়ায় অনেকেই এটাকে তাদের জন্য একধরণের সুরক্ষা হিসেবে দেখছে। এ সুযোগ সব ধরণের ন্যায় নীতির বিরুদ্ধে এবং অর্থনৈতিক নীতির পরিপন্থি। এটি সাম্য পরিপন্থি, রাজনৈতিকভাবে উপকারী নয় এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের সংবিধানে সব নাগরিকের যে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। আসিফ ইব্রাহিম এ বিষয়ে বলেন, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ কখনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হতে পারে না। বিভিন্ন দেশে স্বল্পমেয়াদে সুযোগ দেওয়ার উদহারণ আছে। প্রত্যেক বছরই দেওয়া এবং রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবে এটাকে দেখা, এটা যেন নিয়মে পরিণত না হয়। সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, অপ্রদর্শিত কিন্তু অবৈধ পথে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে এই সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। এছাড়া এ প্রক্রিয়ার কারণে সৎ করদাতাদের প্রতি ভুল সংকেত যাচ্ছে। এখন না দিলে পরের বছর মাত্র ১০ শতাংশে দেওয়া যাবে এমন অনেকেই মনে করছেন। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিভিন্ন দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে যে আর দেওয়া হবে না, তাও বলে দেওয়া হয়। এরপরও কালো টাকার সন্ধান পেলে তার জন্য কী শাস্তি পেতে হবে তারও সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিবছরই এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

এনটিভির হাসানুল শাওন জানতে চান, টাকা খরচের দক্ষতার যে সমস্যা, তার পরিবর্তন কেন হচ্ছে না? কোভিডের জন্য সরকারি প্রণোদনার খুব কম অংশ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী পাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনায় কী ভুল হচ্ছে? এর উত্তরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকারের হালনাগাদকৃত তথ্য ভান্ডারের অভাব রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রথম পর্যায়ের ৫০ লাখ মানুষের জন্য আড়াই হাজার টাকা করে নগদ অর্থ বিতরণের পরিকল্পনার বিপরীতে এই সহায়তা ৪০ লাখ মানুষকে দেওয়া গেছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে টেলিফোন নম্বর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য মিলিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার সরকারের কাছে নেই। গত এক বছরে এটি প্রস্তুতির সুযোগ ছিল। বিতরণের সময় দেখা যাচ্ছে, লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেহেতু শুধুমাত্র প্রশাসনের মাধ্যমে এই কাজটি করা হচ্ছে এবং সামাজিক সংযুক্তি কম দেখা গেছে সেহেতু বিতরণে সমস্যা হচ্ছে। অসহায় মানুষের জন্য রাজনৈতিক গুরুত্ব বা মনোযোগ কম। এছাড়া তালিকার বাইরেও প্রচুর মানুষ রয়ে গেছে। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তথ্য উপাত্তের ঘাটতি একটা বড় বিষয়। করোনার জন্য প্রথমে থানা পর্যায়ে সহায়তা বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ২০১৪ সালের তালিকা ব্যবহার করতে হয়েছে। ২০১৭ সালে একটি সমন্বিত দারিদ্র্য ডাটাবেজ তৈরির জন্য বিবিএসের উদ্যোগ ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

ডিবিসি নিউজের মোস্তফা মাহমুদ প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা এত কম থাকার বিষয়ে মূল প্রবন্ধে উল্লেখিত পর্যালচনার ব্যাখ্যা চাইলে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এর উত্তরে বলেন, করোনার প্রথম অর্থবছরে (২০১৯-২০) সহায়তার ৯৪ দশমিক ১৪ শতাংশ ছিল হাইব্রিড অর্থাৎ ঋণ। খাদ্য সহায়তা ছিল ৪ দশমিক ২৩ শতাংশ। আর্থিক সহায়তা ছিল ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। দ্বিতীয় বছরে সুদ ভর্তুকিতে গেল প্রায় ৫৬ শতাংশ। খাদ্যে কিছু যায় নি। আর্থিক সহায়তা হলো প্রায় ৪৪ শতাংশ। কিন্তু আরেকটু গভীরে গিয়ে দেখা গেল, কৃষি ভর্তুকি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ অন্যান্য খরচ বাদ দিলে প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশে চলে আসে, যা জিডিপির শুন্য দশমিক ১৯ শতাংশ। নগদ বিতরণ হয়েছে বরাদ্দের ৬৩ শতাংশ। খাদ্য সহায়তাও অর্ধেক বিতরণ হয়েছে।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য

সভাপতির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সার্বিক অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী ও শিশু অধিকার, ব্যক্তিখাত সহ বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য এসেছে। কোভিড অতিমারির প্রেক্ষাপটে বাজেটকে কীভাবে দেখতে চাই সে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বছরের পর বছর বাজেট হয় কিন্তু নতুন কিছু থাকে না। এক সময় একটি মানবাধিকার সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন, আবুল মাল আবদুল মুহিত অর্থমন্ত্রী থাকাকালে বাজেটের আগে বিভিন্ন সংগঠনের মতামত নিতেন। পরে দেখা গেছে, বাজেটে সেই আলোচনার প্রতিফলন নেই। নীতি নির্ধারকরা যেভাবে সম্পদ বন্টনের চিন্তা করেন, সেভাবেই শেষ পর্যন্ত করেন। এরপরও নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এ নিয়ে আলোচনা করা।

তার মতে, মানুষ নানাভাবে সংকটের মধ্যে আছে। তারা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছে। কাজেই সেই জায়গায় রাষ্ট্রের বিরাট দায়িত্ব আছে যেহেতু বাজেট সামনে, এটা একটা সুযোগ। অতিমারির ক্ষতি থেকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা যাবে, সে বিষয়ে আলোচকরা কথা বলেছেন। দক্ষ বন্টনের কথা এসেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কথা এসেছে। জীবনমানের উন্নতির কথা আলোচনা হয়েছে। বাজেটের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের অবস্থার কীভাবে উন্নতি করা যাবে সে বিষয়ে নানা সুপারিশ এসেছে। ঢালাওভাবে না করে সুবিধাবঞ্চিত কিছু জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিস্ট কিছু মনোযোগ দিয়ে

আলাদা সহায়তার প্রস্তাব এসেছে। সম্পদের ব্যবস্থাপনার ওপর আলোচকরা বেশ জোর দিয়েছেন। কারণ সম্পদের অভাব মূল সমস্যা নয়, সম্পদের ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই মূল সমস্যা। এর সঙ্গে তিনি মানসিকতার বিষয়টি যোগ করতে চান। কেননা যারা বাজেট করছেন, তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকতে হবে, পিছিয়ে পড়া মানুষ যাতে আরও পিছিয়ে না যায়। পিছনে চলে যেতে যারা বাধ্য হচ্ছেন তাদেরকে আগের জায়গায় ফেরত দেবার রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে বাজেট প্রণীত হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

সুলতানা কামাল আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এ সময়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে মানুষের কথা বলা হয়েছে। মানুষ আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশকে সব মানুষের দেশে পরিণত করার চিন্তা-ভাবনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে কি না সেটাই বিবেচ্য। রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন, তাদের ওপর এই দায়-দায়িত্ব বেশি বর্তায়। তিনি মনে করেন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও কর ন্যায্যতা না থাকলে মানুষ কর বিমুখ হবে। করের ক্ষেত্রে অনৈতিক কাজ যারা করেছেন, তারা যেন সুযোগ না পায়। যেসব সুযোগ দেওয়া হবে তা যেন যৌক্তিক হয়, নৈতিক হয়। সৎ, স্বচ্ছ ও ন্যায়বিচারসম্পন্ন একটা বাজেট হওয়া উচিৎ।

সবশেষে তিনি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে যেসব সমস্যা ও সুপারিশের কথা এসেছে তা তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহবান জানান।

Platform Briefing Notes

Briefing Note 01	:	**Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors' in COVID-19 Response Activities.** (June 2020)
Briefing Note 02	:	**Post- 'General Holidays' Health Risks.** (June 2020)
Briefing Note 03	:	**New Challenges for SDGs and Budget 2020-21.** (October 2020)
Briefing Note 04	:	**Experiences from the Current Situation at the Grassroots Level.** (October 2020)
Briefing Note 05	:	**Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives.** (October 2020)
Briefing Note 06	:	**Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages.** (February 2021)
Briefing Note 07	:	**Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementation.** (March 2021)
ব্রিফিং নোট ০৮	:	**কোভিড ১০ টিকা: বাংলাদেশে কে, কখন, কীভাবে পাবে?** (জানুয়ারি ২০২১)
Briefing Note 09	:	**Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses?** (February 2021)
Briefing Note 10	:	**Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money Coming?** (February 2021)
ব্রিফিং নোট ১২	:	**অবশেষে স্কুল খুলছে: আমরা কতখানি প্রস্তুত** (এপ্রিল ২০২১)

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
কোর গ্রুপ সদস্য
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী

প্রারম্ভিক উপস্থাপনা

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সূচনা বক্তব্য

আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ
সমন্বয়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

কোর গ্রুপের পক্ষ থেকে বক্তব্য

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

রাশেদা কে চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)
এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড
ও
সাবেক সভাপতি
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)

ড. মুশতাক রাজা চৌধুরী
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

আসিফ ইব্রাহিম
ভাইস চেয়ারম্যান
নিউএইজ গ্রুপ অফ ইন্ড্রাস্ট্রিজ এবং
চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: জাকির হোসেন এবং অন্বেষা জাফরিন
সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

UNDP | actionaid | Canada | Centre for Policy Dialogue | christian aid | Friedrich Ebert Stiftung | ICCO Cooperation | Plan International | WaterAid

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

মে ২০২১